দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 15 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

একটি জরিপের ফল

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী সফল হচ্ছে না

নির্মল চক্রবর্তী

শিক্ষাই আলো। এই আলোতেই অভীষ্ট লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো যায় সামনের দিকে। আর সামনে এগিয়ে যাবার মানেই তো উন্নয়ন, সমৃদ্ধি। এক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষায় অগ্রগামী হলেই সব কিছুতেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

আমাদের দেশ আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যাবহুল। প্রায় ১২ কোটি মানুষের বসতি এখানে। অথচ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রয়েছে অধিকাংশ মানুষ। তারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকছে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক তথা জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকছে। ফলে দেশের সমৃদ্ধি আসছে না। হচ্ছে না কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি। দারিদ্র্য, রোগ, শোক, হতাশা বেড়েই চলছে। খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসার জন্য ক্রমেই মানুষ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে বিদেশের কাছে। সম্পৃক্ত হতে পারছে না উন্নয়ন ধারায়। এ ধরনের ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতি বদলও জাতির জন্য বাস্তবিকই লজ্জাকর।

বর্তমান সরকার দেশের সার্বিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে "সবার জন্য শিক্ষা"কে বাধ্যতামূলক করেছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীও ঘোষণা করেছে। যা ১৯৯৫-এর জানুয়ারি মাস থেকে প্রায় সব অঞ্চলেই কার্যকরী করা হয়েছে। এছাড়া নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য এসএসসি পর্যন্ত দেয়া হয়েছে বহুমুখী সুবিধাসহ বৃত্তির সুযোগ। প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ গোটা দেশে তৈরি ও সংস্কার করা হয়েছে ব্যাপকসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা। জাতিকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করা।

সরকারের শিক্ষা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য যে মহৎ তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। নেই কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব। কিন্তু কর্মসূচীর বাস্তব প্রয়োগ ঘটেছে কমই। এসব কর্মসূচী তাই পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে।

সম্প্রতি এ বিষয়ে দেশের ১ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের ওপর এক জরিপ চালানো হয়েছে। যতদূর জানা যায়, ফল ততটা আশানুরূপ নয়। কারণ আজকের এ প্রযুক্তির যুগে শুধু নিরক্ষরতা দূর করাই যথেষ্ট নয়। চাষাবাদের আধুনিক কলাকৌশলের আংশিক প্রয়োগের জন্যও কিছুটা লেখাপড়া জানা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য থাকতে অধিকাংশ লোভাদ্যর অভিভাবক শুধুমাত্র খাদ্য পাবার উদ্দেশ্যে তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠায়। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণের জন্য নয়। এছাড়া স্কুলের হাজিরা খাতায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা যত দেখানো হয় পরিদর্শনের সময়, প্রকৃতপক্ষে ততসংখ্যক শিশু স্কুলে পড়াশোনা করতে যায় না। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, স্কুলে গিয়ে শিশুরা যেটুকু অক্ষরজ্ঞান লাভ করে, প্রয়োগের অভাবে তার সবটা ভুলে যায়। দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা কর্মক্ষেত্রে এই জ্ঞান প্রয়োগের সুযোগ তেমন নেই। ফলে এত আয়োজনের ফল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারছে না।

আর এ জন্যই এত কিছুর পরও আমাদের সাক্ষরতার হার মাত্র ৩৬.৬%। আর এ হারের মধ্যে যারা রয়েছে তারা সবাই ভালভাবে লিখতে, পড়তে এবং হিসাব-নিকাশ করতে পারে না। কোন রকমে নাম লিখতে পারে মাত্র। অথচ মালয়েশিয়ার মতো দেশেও শিক্ষার হার এখন ৮০%। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশে এ শিক্ষার হার গড়ে প্রায় ৮০% বা তার ওপরে। আর এ জন্য ঐ দেশগুলো জ্ঞান-বিজ্ঞানে তথা প্রযুক্তির সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছে।

যাই হোক, অনেক পরে হলেও আমাদের দেশে শিক্ষা সম্প্রসারণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে যে কারণগুলো এ কর্মসূচীকে ব্যাহত করছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। দিতে হবে মনোযোগ। এর মধ্যে যেমন শুধু খাদ্য বিনিময় করে শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রয়াস না করা। বরং সামাজিক, পারিবারিক তথা ব্যক্তি পর্যায়ে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে। অনুধাবন করতে হবে এর গুরুত্ব। আর এতে একবার সফল হলে অভিভাবকরা নিজ দায়িত্বে নিজস্ব তাগিদেই তাদের শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাবে। খাবারের লোভে নয়। নির্লোভ শিক্ষা লাভের মধ্য দিয়ে ঘটবে প্রকৃত শিক্ষার সম্প্রসারণ।

দ্বিতীয়ত, প্রকৃত স্কুলগামী শিশুর সংখ্যার সাথে হাজিরা খাতায় নাম তোলা শিশুর সংখ্যার সামঞ্জস্য রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে প্রকৃতপক্ষে যেসব শিশু স্কুলে যাচ্ছে না এবং নিরক্ষর থাকছে, তার সঠিক সংখ্যা পাওয়া যাবে। সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক শিশুদের কাছে যেতে হবে। তাদের অভিভাবকদের ডেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

তৃতীয়ত, শিশুরা যেটুকু শেখে তা ধরে রাখার ব্যবস্থা করাও জরুরী। আর সে জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের কর্মক্ষেত্রে সামান্য লেখাপড়া চর্চার ব্যবস্থা বজায় রাখা। বিশেষ করে যে কোন শ্রমের পারিশ্রমিক স্বাক্ষর করে। যাতে তারা ভুলতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এ ধরনের ব্যবস্থা থাকলে পুনরায় নিরক্ষর হবার অবকাশ থাকবে না।

সর্বোপরি শিশুদের জন্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়ানো দরকার। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়, দেশের বিভিন্ন স্থানে সুযোগ-সুবিধার অভাবে লাখ লাখ শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর মধ্যে কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ার ২০ হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। সেখানকার থানা শিক্ষা শিশু জরিপ অনুযায়ী শিশুর সংখ্যা ৮৪ হাজার ২৭২ জন। আর স্কুলগামী নয় এমন শিশুর সংখ্যা প্রায় ৩০ হাজার।

ময়মনসিংহের মতো জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়েছে ১ লাখ শিশু। জেলা শিক্ষা জরিপে পাওয়া এ তথ্যে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। হয়েছেন হতবাক। কারণ দেখা গেছে, জেলার ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৬ লাখ ৯৫ হাজার ৯৪৪ জন। এর মধ্যে ৬ লাখ ৬ হাজার ৫০৯ জন বিদ্যালয়ে যায়, আর ৮৯ হাজার ৪৬৫ জন শিশু এখনও স্কুলে যায় না। আরও দেখা যাচ্ছে, ঐ জেলার ২৬৮৩টি গ্রামে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২৪৫টি এবং বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪১৫৭টি। জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ৫০৪৯টি পদের মধ্যে শূন্য রয়েছে ১৬৬টি। ২৫টি ইউনিয়নে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু করা হয়েছে। এসব স্কুলে গমনকারী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩০ হাজার, যা হতাশাব্যঞ্জক। এটা যে শুধু ময়মনসিংহ এলাকার চিত্র তা নয়, বরং গোটা বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলায় এরকম পরিস্থিতি বজায় রয়েছে। এ জন্য খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীকে সফল করে তুলতে হলে গ্রহণ করতে হবে কার্যকর পদক্ষেপ। এই জরিপ সে দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকার ও সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি ভেবে দেখবে আশা করি।